বাংলাদেশ উন্নয়ন নীতি : শুল্ক কাঠামো বদলানো দরকার

আশরাফ আলী

(১) বাজার বনাম প্রযুক্তি: আগে বাজার - পরে প্রযুক্তি

মূলতঃ দুটি তাত্ত্বিক ধারণাকে সামনে রেখে বিডিআই-এর কার্যক্রম শুরু হয়। এর একটা হলো 'প্রযুক্তি', আরেকটি 'বাজার'। 'প্রযুক্তি' হচ্ছে সামাজিক অগ্রগতির অব্যর্থ প্রতিবিম্ব। আর 'বাজার' হচ্ছে একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে 'প্রযুক্তি' সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে, অর্থাৎ সমাজে নৈর্ব্যক্তিক গতি লাভ করে। উৎপন্ন পণ্যের বাজার না থাকলে সমাজে প্রযুক্তির শেকড় গাঁড়তে পারে না।

তাহলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে : বাজারের প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তা ছাড়াই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিযুক্ত হলে তার পরিণতি কি হবে। সেটা হবে শেকড় ছাড়া গাছ বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াস মাত্র। তাই দেখা যায় বাংলাদেশে উচ্চ প্রযুক্তি দিয়ে তৈরী পণ্যাদির ব্যবহার থাকলেও সম্ভাব্য দেশজ উচ্চ প্রযুক্তির কদর দেশের ভিতরে একেবারেই নেই। অনেকে উচ্চ প্রযুক্তিকে ঠাট্টা করে 'হাই থট' বলেন। আসলে প্রযুক্তি নিয়ে সময় ব্যয় না করে বাজার নিশ্চয়তা করাটাই হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক কাজ। অর্থাৎ প্রযুক্তির কথা না ভেবে 'আগে' বাজারের কথা ভাবতে হবে।

ঠিক এই কারণে বিডিআই বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাকে 'সরবরাহ' নয়, বরং 'চাহিদা'র সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে আসছে। এক্ষেত্রে সরবরাহ হচ্ছে প্রযুক্তির অন্য নাম এবং চাহিদা হচ্ছে বাজারের অপর নাম। বাংলাদেশ যে সরবরাহ নয়, বরং চাহিদা সমস্যায় আক্রান্ত - এই তত্ত্ব আবিষ্কার ও উপলব্ধির গুরুত্ব বোঝা অপরিহার্য।

বস্তুতঃ ন্যূনতম তাত্ত্বিক দিক-নির্দেশনা ছাড়া কর্মসূচী গ্রহণ করাটাই ঝুঁকিপূর্ণ। যেমন ধরুন বাংলাদেশ অর্থনীতির 'চাহিদা' সমস্যাকে অবহেলা করে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সরকার যদি 'সরবরাহ' সমস্যা সমাধানে তৎপর হয় তাহলে সে-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক।

সঙ্গত কারণে শুরু থেকেই বিডিআই তার সার্বিক কার্যক্রমকে মূলতঃ দুটি ভাগে ভাগ করে নেয়। এক ভাগ হলো, বাংলাদেশের ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক নীতি-সম্পর্কিত ফর্মূলা নির্ধারণ করা। আর দ্বিতীয় ভাগ হলো, নির্ধারিত নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত কার্যক্রম হাতে নেওয়া। কেউ কেউ মনে করতে পারেন অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের কাজটি সহজ। আবার অনেকে এর আবশ্যকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সঠিক নীতি নির্বাচন করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন এবং সর্বপ্রধান কাজ। এই কৌশলগত পরিকল্পনা থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি দার্শনিক কাঠামো তৈরী হবে। একবার দার্শনিক অবস্থানটি নির্ধারিত হয়ে গেলে প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি এর ফলশ্রুতি হিসাবে অনায়াশে স্থির হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাকে বাজার বা চাহিদার সমস্যা হিসাবে সনাক্ত করার মাধ্যমে বিডিআই ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের কাজটি সম্পাদন করে ফেলেছে। ফলে কোন্ ধরণের প্রকল্প হাতে নিতে হবে, কোন্ প্রকল্প অন্যান্য প্রকল্পের উপর অগ্রাধিকার পাবে,

কোন্ প্রকল্প অর্থনৈতিক চালিকা-শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে এবং কোন্ প্রকল্প কেবল অন্য প্রকল্পের অনুসারক হিসাবে কাজ করতে পারে - তা এই সিদ্ধান্তের সাহায্যে তুলনামূলকভাবে সহজে স্থির করে ফেলা যাবে।

(২) 'মেইনস্ট্রিম' অর্থনৈতিক উন্নয়ন বনাম অর্থনৈতিক 'একটিভিজম': 'মেইনস্ট্রিম' উন্নয়নের গুরুত্ব সর্বাধিক

বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অজস্র প্রকল্প আপাতঃদৃষ্টিতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পরিবার পরিকল্পনা বা জনসংখ্যা, ঘুষ/দুর্নীতি, পরিবেশ দূষণ, নারীমুক্তি/নারী-অধিকার, শিক্ষানীতি, পল্লী-উন্নয়ন, দারিদ্র্য-মোচন, ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে কথা বলার সময় মানুষকে সহজেই আবেগপ্রবণ হতে দেখা যায়। গ্রামীণ ব্যাংক, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্রাক, নিজেরা করি, আশা, ইত্যাদি অনেক এনজিও এই ধরণের প্রকল্প নিয়ে গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে কাজ করে আসছে। অর্থনীতিবিদগণ খুব ভালভাবেই জানেন এই ধরণের কাজ আদৌ 'মেইনস্ট্রিম', অর্থাৎ মূলধারার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশ নয়। এগুলিকে বড়জোর অর্থনৈতিক 'একটিভিজম' বা স্বেচ্ছাসেবিতা বলা যায়। এসব কাজ জাতীয় উন্নয়নের প্রধান অংশ বলে গণ্য হতে পারে না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারার কাজ এই সব প্রতিষ্ঠানের এক্তিয়ারের বাইরে।

'মেইনস্ট্রিম' অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি 'প্রতিযোগিতা' দ্বারা পরিচালিত হয়। এই নীতির অধীনে উৎপাদক, শ্রমিক, ক্রেতা ও ভোক্তা নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর হয়। এর ফলশ্রুতি হিসাবে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া অনেকটা যেন অদৃশ্য একটি হাতের ইশারায় নৈর্ব্যক্তিকভাবে সামনের দিকে ধাবিত হয়। এই পুরানো কথাটি এখানে নতুন করে বলার প্রয়োজন ছিল।

অর্থনীতিবিদগণ, বিশেষতঃ বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদগণ, মুক্ত-বাজার প্রতিযোগিতার তত্ত্ব ও এর কার্যকারিতা/সুফলতা সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন। প্রথমতঃ তাঁরা পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও জাপানের প্রতিযোগিতাভিত্তিক মুক্ত-বাজার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস জানেন। এই সব দেশ ও জাতি প্রতিযোগিতাভিত্তিক মুক্ত-বাজার অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োগ করে স্বদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। এসব ইতিহাস জানা সত্ত্বেও এই একই অর্থনীতিবিদগণ যখন বাংলাদেশ তথা উন্নয়নশীল বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তাঁরা অর্থনীতির এই মৌলিক ও অপরিহার্য নীতিটি ভুলে গিয়ে 'একটিভিস্ট' বনে যান। এই প্রবণতা খুবই দুঃখজনক ও মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর।

(৩) বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায়: 'রেন্ট-সিকিং'

তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু লেখক/অর্থনীতিবিদ এ-দেশের উন্নয়ন সমস্যার সঠিক বিশ্লেষণ জানেন। এই ধরণের লেখক ও অর্থ-সমাজ বিশেষজ্ঞদের লেখা পড়লে বোঝা যায় এঁরা জানেন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায়গুলি কি কি এবং কি ব্যবস্থা নিয়ে এগুলি অপসারণ করা যাবে। সমাধানের সঠিক পন্থাটি এই নিবন্ধের শেষে আলোচনা করা হবে। প্রথমে দেখা যাক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়গুলি কি কি।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশও উৎপাদক শ্রেণী নয়, বরং ট্রেডার/ব্যবসাদার শ্রেণী ও তাদের সহযোগী-সহচরদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আস্‌ছে। সঙ্গত কারণেই এই শ্রেণী স্বদেশে উৎপাদনের পরিপন্থী। এই ক্ষমতাশীন শ্রেণী উচ্চ মূল্যের পূর্ব-প্রস্তুত 'ক্যাপিটাল গুড্‌স' ও অন্তর্বর্তীকালীন পণ্যদ্রব্য আমদানী ও তৎসম্পর্কিত নানাবিধ কার্য-কলাপ থেকে সৃষ্ট আয় অর্থাৎ 'রেন্ট' এর উপর মূলতঃ নির্ভরশীল। স্বদেশে উচ্চ মূল্যের পণ্য উৎপাদন

শুরু হলে এগুলির আমদানী হ্রাস পাবে অথবা বন্ধ হয়ে যাবে। এতে করে এই শ্রেণীর মূল উপার্জ্জনের পথটি বন্ধ হয়ে যাবে।

এই ট্রেডার শ্রেণীর সাথে আরো দুই/তিনটি গ্রুপ হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে। এগুলো হচ্ছে : সিভিলিয়ান আমলা, মিলিটারী আমলা ও ক্ষমতাশীন রাজনৈতিক দল। বোঝা যাচ্ছে, রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসে আর যায়, কিন্তু আমলা গ্রুপ দুইটি মূলতঃ ক্ষমতায় অনড় থেকে যায়। যে-কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতাশীন থাকলেই তবে এই 'রেন্ট' এর অংশীদার হতে পারে। বাংলাদেশে তথাকথিত ভোটের গণতন্ত্রের ষোল/সতেরো বছর পর এতদিনে স্পষ্ট হওয়া উচিৎ বি-এন-পি, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির ক্ষমতা দখল করার উৎসাহের পিছনে দেশপ্রেম কাজ করে না, কাজ করে এই 'রেন্ট' এ ভাগীদার হবার 'ইনসেন্টিভ'।

বাংলাদেশের মাটিতে এই ভোটাভুটির গণতন্ত্রের কোনো শেকড় গজায়নি। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব থেকে। দেশে সঠিক তথা জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রের প্রতিফলন তখনই হবে যখন প্রতিটি রাজনৈতিক দল স্ব স্ব দলের মধ্যে গণতন্ত্রের 'প্রাকটিস' শুরু করবে। আপাততঃ উপরোক্ত চারটি গ্রুপের অন্তর্ভূক্ত কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ ক্ষমতাশীন মানুষই কেবল বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে লাভবান হয়, অবশিষ্ট কোটি কোটি বাংলাদেশী এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে যায় অথবা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে শুল্ক, ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ মুষ্টিমেয় কয়েক হাজার/লক্ষ বাংলাদেশীর মদদ যোগায়।

স্বদেশে উচ্চ মূল্যের পণ্য উৎপাদন ব্যতিরেকে বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর যে-কোনো উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। কারণ, উচ্চ মূল্যের পণ্য উৎপাদনে উচ্চ প্রযুক্তির প্রয়োগ আবশ্যক এবং সমাজে উচ্চ প্রযুক্তির চর্চাই কেবল সামাজিক অগ্রগতিকে পাকাপাকিভাবে নিশ্চিত করতে পারে। বিডিআই কর্তৃক গৃহীত নীতিনির্ধারণী ফর্মূলা ব্যবহার করে বলা যাবে : এই উৎপাদন শুরু হবার পথের অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে 'চাহিদা' বা 'বাজার' সমস্যা।

চাহিদা/বাজার সমস্যা কিভাবে সৃষ্টি হয় তার প্রক্রিয়াটি বোঝা অত্যন্ত জরুরী। উপরোক্ত ট্রেডার শ্রেণীর নেতৃত্বাধীনে এবং অপর দুই/তিনটি শ্রেণীর সহযোগিতায় বাংলাদেশের শুল্ক কাঠামোকে কৃত্রিমভাবে উৎপাদনবিরোধী করে রাখা হয়েছে। উচ্চ মূল্যের পণ্য, যেমন 'ক্যাপিটাল-ডুরেবোল গুড্স্' এবং অন্তর্বর্তীকালীন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্যি। দেখা গ্যাছে এই ধরণের পণ্য আমদানীর উপর নামমাত্র ৫% অথবা তার চেয়েও কম আমদানী শুল্ক বসানো হয়েছে যাতে করে এই পণ্যগুলি সহজে আমদানী এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি করা যায়। অপরদিকে, এই পণ্যদ্রব্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান, যেমন, কাঁচামাল, বিদ্যুৎ/জ্বালানী, ইত্যাদির উপর অত্যন্ত চড়া ৫০% থেকে ১৫০% শুল্ক বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফলে স্বদেশে উৎপাদিত 'ক্যাপিটাল-ডুরেবোল গুড্স্' ও অন্তর্বর্তীকালীন পণ্যদ্রব্যের দাম এতটা বেড়ে যায় যে এগুলি বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। এভাবে বাংলাদেশে 'ক্যাপিটাল-ডুরেবোল গুড্স্' ও অন্তর্বর্তীকালীন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে উৎপাদিত 'পাউয়ার লুম' বা স্বয়ংক্রিয় তাতের কথা ধরা যায়। বাংলাদেশে উৎপাদিত এক 'ইউনিট' পাউয়ার লুম প্রায় ৩৫০০০/৪০০০০ টাকা দামে বিক্রি হয়। অপরপক্ষে জাপান থেকে আমদানীকৃত 'রিকণ্ডিশাণ্ড' পাউয়ার লুমের দাম পড়ে প্রায় ৫৫০০০/৬০০০০ টাকা।

বিদেশ থেকে আমদানীকৃত 'রিকণ্ডিশাণ্ড' পাউয়ার লুমের গুণগত মান বাংলাদেশে নির্মিত নতুন পাউয়ার লুমের তুলনায় উঁচু। ফলে দাম হাজার বিশেক টাকা বেশী হওয়া সত্ত্বেও ক্রেতারা বিদেশী পাউয়ার লুমই কিনেন। তাতে করে বাংলাদেশী উৎপাদক ক্রমাগত

প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছেন এবং নিরুপায় হয়ে কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছেন। স্বদেশী পাউয়ার লুম নির্মাতাগণ ক্রেতাকে মেরামত ও খুচরো যন্ত্রাংশ সহজে ও সুলভ মূল্যে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও ক্রেতারা উচ্চ গুণমানের রিকণ্ডিশাণ্ড বিদেশী পাউয়ার লুম কিনছেন। ধরে নেওয়া যায় ক্রেতাগণ রিকণ্ডিশাণ্ড পাউয়ার লুম থেকে হাজার বিশেক টাকার চেয়েও অধিক ফল অর্জন করেন। যেমন, ক্রেতারা সম্ভবতঃ বিদেশী পাউয়ার লুম দিয়ে উন্নত মানের কাপড় অধিক পরিমাণে বুনতে পারেন।

এক্ষেত্রে মাত্র হাজার বিশেক টাকার এই পার্থক্য দিয়ে ন্যায্য প্রতিযোগিতার বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তদুপরি কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বদেশী পণ্য এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার উপক্রম করলে উপরোক্ত তিন/চারটি শ্রেণী স্বদেশে উৎপন্ন পণ্যের উপর আরো ১০% বা ১৫% 'ভ্যাট' বসিয়ে দেন। তাতে স্বদেশী উৎপাদক পরাজয় শীকার করতে বাধ্য হন। অনেকটা কণ্ঠরোধ করে হত্যা করার মতো!

(৪) সমাধান: ন্যায্য শুল্ক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন

এখন ধরা যাক, অন্যায্য শুল্ক কাঠামো বিলোপ করে দিয়ে আমদানীকৃত পণ্য, কাঁচামাল, জ্বালানী, ইত্যাদি সবকিছুর উপর সুষমভাবে ১০% শুল্ক বসানো হোলো। এর ফলে বিদেশী রিকণ্ডিশাণ্ড পাউয়ার লুমের দাম ৬৫০০০ থেকে ৭০০০০ টাকায় উঠে যাবে এবং দেশী পাউয়ার লুমের দাম কমে ১২০০০/১৫০০০ টাকায় নেমে আসতে পারে। এতে ক্রেতারা এক ইউনিট বিদেশী পাউয়ার লুমের বদলে প্রায় পাঁচটি দেশী পাউয়ার লুম কিনতে সমর্থ হবেন। এর সাথে দেশী নির্মাতাদের দ্রুত মেরামত ও সহজে খুচরো যন্ত্রাংশ সরবরাহের অঙ্গীকার যোগ করলে ক্রেতারা স্বদেশে নির্মিত পাউয়ার লুমই কিনবেন এবং কিনে লাভবান হবেন।

স্বদেশী নির্মাতাগণ একবার 'বাজার' হাতে পেয়ে গেলে তখন আপন আপন স্বার্থেই উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বাড়ানোর চেষ্টা নেবেন এবং ঠিক তখনই স্বদেশে প্রযুক্তি চর্চার হবে শুরু। স্বদেশী নির্মাতারা বাজারকে আরো কব্জা করার উদ্দেশ্যে তাঁদের পণ্যদ্রব্য সম্পর্কিত কারিগরী সমস্যা সমাধানার্থে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দ্বারস্থ হবেন। স্থায়ী ভিত্তিতে দেশের শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের এটাই মোক্ষম পথ। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে 'বাজার'ই দেশের শিক্ষাঙ্গনের পৃষ্ঠপোষক, বাহক ও রক্ষক। অর্থাৎ সহজ কথায় : দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাই সেদেশের শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখে।

এখানে একটি বিষয় বিতর্কিত মনে হতে পারে : আমরা বলছি পণ্যের গুণগত মান 'বাজার' পাওয়া না পাওয়ার উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ তথা উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষিতে এই তত্ত্বটি আবিষ্কারের গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণ জ্ঞানে বলে, পণ্যদ্রব্য বাজার পাবে কি পাবে না তা এর গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল। আসলে মুক্ত-বাজার ও ন্যায্য প্রতিযোগিতার অধীনে অর্থনীতি এই নীতিতেই কাজ করে; এতে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে অন্যায্য শুল্ক তথা অন্যায্য প্রতিযোগিতা বিরাজমান থাকার কারণে স্বদেশী নির্মাতাগণ আভ্যন্তরীণ বাজারে তাঁদের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করার সুযোগই পান না। তাতে পুঁজি সঞ্চয়ন অপর্যাপ্ত হবার কারণে পণ্যের গুণগত মান বাড়াবার সুযোগই তাঁরা পেয়ে উঠেন না।

লক্ষ্য করা দরকার আমরা একটি ন্যায্য শুল্ক কাঠামো প্রতিষ্ঠার কথা বলছি। অতি-জাতীয়তাবাদীরা শুল্ককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে স্বদেশের অর্থনীতির চারপাশে প্রতিরক্ষার দুর্গ গড়ে তোলার প্রস্তাব দিতে পারেন। যেমন, বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ক্যাপিটাল-ডুরেবোল গুড্স ও অন্তর্বর্তীকালীন পণ্যদ্রব্যের উপর চড়া ৫০% থেকে ২০০% পর্যন্ত শুল্ক বসিয়ে দেবার কথা বলতে পারেন। একই সাথে এই ধরণের দ্রব্যাদি স্বদেশে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত উপাদানের উপর নামমাত্র ১% বা ২% শুল্ক আরোপ করার পরিকল্পনা করতে

পারেন। এরূপ প্রতিরক্ষাকৃত অর্থনীতির ছত্রছায়ায় স্বদেশী নির্মাতারা সহজেই বাজার পেতে পারেন এবং দ্রুত পণ্যদ্রব্যের মান বৃদ্ধি করতে তৎপর হতে পারেন।

বিশ্বের অনেক দেশ শুরুতে এভাবে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যাত্রা শুরু করেছিল। উদাহরণস্বরূপ মালোয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও চিন দেশের কথা বলা যায়। কিন্তু আমরা শুল্ক কাঠামো উল্টিয়ে দিয়ে প্রতিরক্ষার দুর্গ গড়ার প্রস্তাব দিচ্ছি নে। আমরা বলছি, মুক্ত-বাজার অর্থনীতির নীতি অনুসারে বাংলাদেশে একটি ন্যায্য শুল্ক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হোক। বাকী কাজ স্বদেশী নির্মাতারা নিজেরাই করতে পারবেন। সরকারের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতার বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়বে না। সফল হবার জন্য যা যা উপাদান লাগে তার সবকিছুই তারা যেভাবেই হোক সংগ্রহ করতে সমর্থ হবেন।

তাই কথাটি সবার মর্ম অবধি পৌঁছে দেবার জন্য আবার বলছি : আপনারা সবাই বাংলাদেশের মঙ্গল চান জানি। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের সবচেয়ে বেশী ও চিরস্থায়ী মঙ্গল হবে যদি দেশের বর্তমান অন্যায্য শুল্কের হারের বিলোপ ঘটিয়ে আপনারা একটি ন্যায্য মুক্ত-বাজার-উপযোগী শুল্ক কাঠামো প্রতিষ্ঠার কাজে শরীক হন। এই কাজই হবে মহত্তম কাজ। এই কাজই হবে সত্যিকার দেশপ্রেমের কাজ।